ইউরোপীয় সাহিত্যের পটভূমিতে

জীবনানন্দের কবিতা

পার্থ গোস্বামী

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

গোড়ার কথা	৯-১১
ভূমিকা ঃ আধুনিক কবিতা ও জীবনানন্দের বর্ণময় কাব্য ঐতিহ্য	১২-২৫
পাশ্চাত্য প্রভাবের বিভিন্ন সূত্রগুলি	২৬-৪৮
অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মহান যুগন্ধর পুরুষেরা	৪৯-৬৮
রঙ্গলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ঃ বিদেশি প্রভাব	৬৯-১০৩
কবিতা ঃ রূপে রূপান্তরে পাশ্চাত্যপ্রভায় জীবনানন্দ	১০৪-১১৮
জীবনানন্দের কাব্যভাবনা	১১৯-১৫৫
জীবনানন্দের মনস্তত্ত্ব	১৫৬-১৮২
কবির বিশ্বাস	১৮৩-১৮৯
সৃষ্টির সমান্তরালভূমি	১৯০-৪১৯
জীবনানন্দ ঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ	১৯৯-২০৬
জীবনানন্দ ঃ কিট্‌স	২০৬-২১৯
জীবনানন্দ ঃ শেলি	২১৯-২৩২
জীবনানন্দ ঃ কোলরিজ	২৩২-২৩৫
জীবনানন্দ ঃ ব্লেক	২৩৫-২৪৭
জীবনানন্দ ঃ শেক্সপিয়র	২৪৮-২৬৬
জীবনানন্দ ঃ হুইটম্যান	২৬৭-২৯১
জীবনানন্দ ঃ ব্রাউনিঙ	২৯১-২৯৮
জীবনানন্দ ঃ প্রি-রাফেলাইট কবিগোষ্ঠী	২৯৮-৩০১
জীবনানন্দ ঃ ফরাসি সংকেতবাদী কবিগোষ্ঠী	৩০১-৩০২
জীবনানন্দ ঃ বোদ্‌লেয়ার	৩০৩-৩১৪
জীবনানন্দ ঃ ভেরলেন	৩১৪-৩১৫
জীবনানন্দ ঃ ভালেরি	৩১৬-৩১৯

জীবনানন্দ ঃ র‍্যাঁবো ৩১৯-৩২১

জীবনানন্দ ঃ পো ৩২২-৩২৩

জীবনানন্দ ঃ রিলকে ৩২৩-৩৩০

জীবনানন্দ ঃ পাউন্ড ৩৩০-৩৩৭

জীবনানন্দ ঃ মালার্মে ৩৩৭-৩৩৯

জীবনানন্দ ঃ ইয়েটস ৩৩৯-৩৬৯

জীবনানন্দ ঃ এলিয়ট ৩৬৯-৪১৬

জীবনানন্দ ঃ হপ্‌কিন্‌স ৪১৬-৪১৯

ফিরে দেখা ৪২০-৪২৬

শেষ নাহি যার শেষ কথা কে বলবে ৪২৭-৪২৮

গ্রন্থপঞ্জি ৪২৯-৪৪০

গোড়ার কথা

১৯৯৪-৯৫ সালে মনে হয়েছিল '৯৯-এ তো জীবনানন্দের জন্মশতবর্ষ,— এখনও বহু দেরি। পড়াশুনো করতে বছর তিনেক, লিখতে একবছর, আর ছাপতে দু-মাস। তাহলে জন্মশতবর্ষের বছরে বেরিয়ে যাবে বই। কিন্তু তা হল কই? জলে নামতেই একেবারে একবুক জল, — তবে আর তা বাড়ে নি। রামেশ্বরমের সমুদ্রের মতো। সেই জল সাঁতরে আসতে লেগে গেল প্রায় এগারো বছর। অবশ্য মাঝখানে অন্য একটা কাজে (Social Political and Literary History of England, 2001) বছর দুয়েক নিয়েছিলাম। যাই হোক শেষ পর্যন্ত একটা সম-এ এসে গেলাম। তবে জীবনানন্দ বিষয়ে এই ধারার সবে শুরু।

প্রত্যেক যুগেই যুগন্ধর পুরুষেরা চেষ্টা করেন সেই যুগের একটি রেখাচিত্র দিতে —

" Through the ages one increasing
purpose runs,
And the thoughts of men
And widened with the process of the sun".
[Lord Tennyson]

রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে অনেকের সঙ্গে জীবনানন্দ এলেন, কিন্তু ভিন্ন স্বর, সবাইকার সঙ্গে থেকেও একেবারেই আলাদা। তবুও তাঁকে চিহ্নিত করা হল প্রকৃতির কবি — নির্জনতার কবি হিসেবে। নারকেলের শক্ত খোলার মতো প্রকৃতি — নির্জনতা ছিল তাঁর বহিরঙ্গ। সেই খোলার ভেতরের শাঁস নিয়ে এল অন্য এক বাস্তবতা অন্য এক শৈলী যার সঙ্গে তখনকার গণমানস তো দূরের কথা, বিশিষ্ট অধ্যাপক কবি-সমালোচকেরাও পরিচিত হতে পারেন নি। তারপর ধীরে ধীরে সেই ভাষা সেই তন্ময়তা বিংশ শতাব্দীর শেষে এবং একবিংশের গোড়ায় এসে বাঙ্ময় হয়েছে অন্য ছন্দে অন্য মাত্রায়। রবীন্দ্রকবিতার সৌন্দর্য যে বয়সে মুগ্ধ করে সেই বয়সেই হাতে পেয়েছিলাম জীবনানন্দের 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা'। পড়েছি আর গুনগুন করেছি। অবাক হয়ে ভেবেছি এর বিন্যাস আর এনাটমি। এমনটা যে তখন কেন হয়েছিল তা — এখন বুঝতে পারি। কারণ তখন খুব ছবি আঁকতাম, তাই ছবির ভাষা আমাকে টেনেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে পড়লাম 'কবিতার কথা', 'মহাপৃথিবী', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। তখন একটু আধটু এখানে সেখানে লিখছি—কখনও কবিতা কখনও প্রবন্ধ। তখনও ভেবে উঠতে পারিনি যে জীবনানন্দকে নিয়ে কখনও লিখব। 'নির্বাণ' পত্রিকা করতে করতে পত্রিকার (নির্বাণ) অন্যতম সম্পাদক দাদা-কাম-বন্ধু কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় আমাকে জীবনানন্দের কবিতার জগৎ নিয়ে লেখবার কথা বলেন—। সেই শুরু। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত' বইটি আমাকে উপহার দিলেন আমার মধ্যেকার আমিটাকে আরেকটু উস্কে দেবার জন্য। তারপর শিক্ষকতা করতে করতে বহুবার মনে করেছি এবারে লিখব। কিন্তু তখনও হাত দিতে পারিনি। আসলে সময় হতে হবে তো। তারপর কী নিয়ে লিখব সেটাও তো ভাবতে হবে। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে

প্রথমেই মাথায় এল জীবনানন্দের ওপরে পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা। কেননা তুলনামূলক সাহিত্য (Comperative literature) একজন কবি সাহিত্যিক শিল্পীকে বুঝতে সাহায্য করে দারুণভাবে। তবে এই বিষয় নিয়ে তেমন বিশেষ কিছু হাতে পাইনি। কখনও কারো লেখায় ইয়েটসের সঙ্গে বা এলিয়টের সঙ্গে বা অন্য কারো সঙ্গে ছাড়া-ছাড়া তুলনা হাতের কাছে পেয়েছি। অবশ্য বীজ হিসেবে তা অনেকখানি। Text হিসেবে জীবনানন্দের কবিতা বারে বারে পড়েছি। বোঝার চেষ্টা করেছি নিজের মতো করে। সেই বোঝাতে ভুল থাকতে পারে — তবে সেই ভুল আমারই এবং তা নিছক অনভিপ্রেত। যা লিখেছি অর্থাৎ যে সব ভাবনা গ্রন্থিত করেছি তার দায় সম্পূর্ণ আমার। কাজটিকে এক ধারাবাহিক সূত্রে যেমন একদিকে গাঁথবার চেষ্টা করেছি, তেমনি অন্যদিকে প্রতিটি অধ্যায়কে আলাদা গুরুত্বে দাঁড় করিয়েছি অর্থাৎ যে কোনো অধ্যায় থেকেই পাঠ শুরু করা যেতে পারে এবং তাতে পাঠকের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা নেই, তবুও ধারাবাহিকতা পাঠকের মননে একধরনের অনুকূল স্রোত বইয়ে দেয়।

প্রারব্ধের ঐতিহ্য এবং সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতাকে পাথেয় করে জীবনানন্দ এগিয়ে গিয়েছিলেন সামনের দিকে এমন একটা সময়ে যখন ঘরে বাইরে আগুন লেগেছে, আর সেই আগুনের আঁচে একদিকে যেমন পুড়ে যাচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তার অন্তর্গত সময় তেমনি অন্যদিকে সেই আগুনের আলোয় কালের জাতকেরা পড়ে নিচ্ছে ভবিষ্যৎ ভবিতব্যকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত কর্মফল দান করেছিলেন জীবনানন্দকে — এ এক অনতিক্রম্য উত্তরাধিকার। দেশীয় ঐতিহ্যে নিজেকে মজবুত করে জীবনানন্দ হাত বাড়িয়েছিলেন পশ্চিমে। অবশ্য তাঁর বহু আগেই ভারতে এবং বাংলায় বিধাতাপুরুষ পাশ্চাত্য মনন ও সংস্কৃতির পসরা সাজিয়ে দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় ভারত এর ফলে খোলস ছেড়েছে এবং গাছে নতুন পাতা আসার মতো অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের তথা বাংলায় সাংস্কৃতিক বিচরণভূমিতে উপস্থিত হয়েছেন রামমোহন, দ্বারকানাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, ডিরোজিও, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের মতো মহান যুগন্ধর পুরুষেরা এবং কখনও ধীর লয়ে বা দ্রুত লয়ে মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে দূরে সরিয়ে জায়গা করে দিয়েছেন আধুনিক মননের—, আর এদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে উপস্থিত হয়েছিলেন রঙ্গলাল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র মধুসূদন যাঁরা বিদেশি ভাবনা ও প্রকরণ গ্রহণ করতে কখনও দ্বিধাবোধ করেননি। এ সমস্ত কথাই বলার চেষ্টা করেছি প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মধুসূদনের চেতনাকে পরিপূর্ণতা দিলেন রবীন্দ্রনাথ যাঁর রুচিস্নিগ্ধ সংযত মনের অনেকটাই পাশ্চাত্য মননে সংপৃক্ত।

জীবনানন্দের ওপরে পাশ্চাত্য প্রভাবের আলোচনায় আসার আগে জীবনানন্দের কাব্যভাবনা, মনস্তত্ত্ব এবং তাঁর বিশ্বাস নিয়ে সাধ্যমতো কখনও প্রাতিষ্ঠানিক আবার কখনও বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক কবির চেতনায় বা অবচেতনায় সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে এক কাব্যতত্ত্ব থাকে। জীবনানন্দও তার ব্যতিক্রম নন। কাব্যতত্ত্বের পাশাপাশি জীবনানন্দের মনস্তত্ত্ব ও বিশ্বাস নিয়ে আলাদা অধ্যায়ের দাবি অস্বীকার করতে পারিনি। মানুষের মন হিমশৈলের মতো —যার বেশিরভাগটাই অপ্রকাশিত। প্রকাশিত মনের পাশাপাশি অপ্রকাশিত মনের তাগিদটাই বেশি এবং নতুন পৃথিবী গড়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ক্ষেত্রটিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশ্বাস—সে যে কোনো ভাবনায়-তত্ত্বে-অবস্থায়—মানুষকে নিয়ে যায় এক বোধের জগতে এবং সেই বোধের নির্যাসটুকুই কবিতা ছবি গান হিসেবে আমাদের কাছে ধরা দেয়।

পটভূমি একটি ছবিকে যেমন বিশেষ মাত্রা দেয় ঠিক তেমনি পাশ্চাত্যের ভূমিকা জীবনানন্দের কবিকৃতিকে কতখানি পূর্ণ করে তা বুঝতে গেলে এতসব কথা বলার প্রয়োজন আছে। অনেকে বলতেই পারেন যে ধান ভানতে শিবের গীতের কী প্রয়োজন! আমি বলি প্রয়োজন আছে, আর যদি অপ্রয়োজনেরই হয় - তাতে ক্ষতি কী। ধান ভান্‌বার যে ক্লান্তি তা শিবের গীতের দৌলতে গায়ে লাগে না। ধান থেকে তো চাল পাওয়া হলই, উপরন্তু, শিবের গীত উপরি পাওনা। জীবনানন্দের কবিতায় পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে কবি শিল্পী দার্শনিক — পাশ্চাত্যের বহু মানুষ তাঁর কাছাকাছি এসেছেন। আবার তেমনই হয়তো আমার অজ্ঞতার জন্য অনেকের উল্লেখ অনুল্লেখ থেকে গেল।

বিগত দশ-পনেরো বছরে জীবনানন্দের ওপরে অনেক লেখা অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। সব সময়ে সব লেখা পড়া সম্ভব হয়নি বা নোট রাখাও সম্ভব হয়নি। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কংসাবতী প্রকল্পের বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার সুকুমার বসু আমার এই কাজের কথা জানতে পেরে তাঁর মূল্যবান উপদেশ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'কবি জীবনানন্দ' বইটি আমাকে উপহার দিয়েছেন। 'আর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক মধু দরিপা তাঁর সংগ্রহ থেকে শীতল ভট্টাচার্যের 'জীবনানন্দ অন্বেষা' বইটি আমাকে ব্যবহার করতে দিয়ে তাঁর বন্ধুকৃত্য করেছেন। —হপকিন্স ও জীবনানন্দের একটি তুলনামূলক আলোচনা আমি লাভ করেছি আমার বন্ধু অধ্যাপক গৌতম বুদ্ধ সুরালের কাছ থেকে। একটি সাহিত্যমূল্য সম্পর্কিত জীবনীগ্রন্থ ১৯৯৯ এ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বের করে জীবনানন্দের ওপরে। বইটি Clinton B. Seely-র 'A Poet Apart'. কিছুতেই বইটি যখন সংগ্রহ করতে পারছি না তখন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের বাঁকুড়া শাখার সম্পাদক গৌতমদা আমাকে বইটি আনিয়ে দেন। এ ছাড়াও আরো অনেকের কাছে মৌখিক উৎসাহ আলোচনার সুবিধে প্রতিনিয়ত লাভ করেছি। বইটির পাণ্ডুলিপি আকারে প্রথম শ্রোতা পাঠক ও সমালোচক আমার জীবনসঙ্গিনী মিতা গোস্বামী। তার নিরন্তর উৎসাহে আমি সাহস করে এগোতে পেরেছি। সর্বোপরি শঙ্করীভূষণ নায়ক এবং তাঁর পুত্র সন্দীপ নায়ক যে আন্তরিকতা ও উৎসাহে এ-বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন তার জন্য এঁদের কাছে আমি ঋণী। আমার দুই পুত্র, একজন কিশোর (পর্জন্যদেব), আরেকজন বালক (ঐশ্বর্য্যদেব)। প্রায় প্রতিদিনই বালক জিগ্যেস করে, "বাবা, কপাতা হল!" আর কিশোরের জিজ্ঞাসা কোন কোন বিদেশি কবি সাহিত্যিকের সাথে জীবনানন্দের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেল। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়েছি, আবার পরক্ষণেই ভেবেছি, আরে এরাই তো আমার জীবনী শক্তি,— আমি লিখছি, আর এরা ভেবে অস্থির। আমার বন্ধুরাও একইভাবে তাড়া দিয়েছে। ভ্রাতৃসঙ্ঘের আশীষদা আমাকে ছোটো ভাই এর মতো স্নেহ করেন, তাঁকে যখন যে বই বলেছি তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সেই বইএর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সর্বোপরি প্রণাম জানাই আমার সেই জীবনদেবতাকে যিনি কখনই কোনো অবস্থাতেই আমাকে ভেঙে পড়তে দেননি, সবসময়েই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন।

২৫ মে, ২০০৭
কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া

পার্থ গোস্বামী

ভূমিকা ঃ আধুনিক কবিতা ও জীবনানন্দের বর্ণময় কাব্যঐতিহ্য

ইংরাজী সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু ১৮৯০-এ। অন্যমতে ১৯০০। বাংলা সাহিত্যকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও কিছুকাল। কাজটা সহজে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "পাঁজি মিলিয়ে মডারনের সীমানা নির্ণয় করবে কে?" তাঁর মতে নদী যেমন পথ পরিবর্তন করে সাহিত্যও তেমনি গতি বদলায়। "সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন — এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে।" আধুনিক বাংলা কবিতার ভূমিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন, "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।" আধুনিক শব্দটি আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাকে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করার মতো নিরাপদ ও ঐতিহাসিক দূরত্বে আমরা পৌঁছে গেছি। নিরাপদ দূরত্বের কারণে আসক্তির বাঁধনে বাঁধা পড়ার ভয় কম। আর ইতিহাস সবসময়ই ভিন্ন যুগে ভিন্ন অর্থ বহন করে। আর এই ঐতিহাসিক কারণেই নিরাপদ দূরত্ব না থাকার দরুন রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে হয়েছিল কালের প্রহার। তাই উনিশ শতকের শেষধাপে বিষয়াশ্রিত কবিতায় অভ্যস্ত পাঠককুল রবীন্দ্রকাব্যে ইতিহাস ও পুরাণের অভাবকে মেনে নিতে পারেনি, গ্রহণ করতে বাধো বাধো ঠেকেছিল তাঁর মরমীয়া উপলব্ধিকে। রবীন্দ্রনাথ তাদের ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন — "লিখিতে হইলে যে বিষয় চাই-ই, এমন কোনো কথা নাই। বিষয় থাকে তো থাক না থাকে তো নাই থাক, সাহিত্যের তাহাতে কিছু আসে যায় না। বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নয়।" নতুন পাঠাভ্যাসে পাঠকদের অভ্যস্ত করলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সময় তাঁকে ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। জীবন ও জগতের মিশ্রিত অখণ্ড সত্তার সত্য রূপটিই তাঁর বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে ধরা পড়েছে। সে সত্য অস্তিবাদীর সত্য, জগতের ইচ্ছার সঙ্গে ব্যক্তিগত ইচ্ছার মেলবন্ধনের সত্য, দার্শনিকতায় যুক্ত কবি-হৃদয়ের সত্য, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের সত্য। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর The Philosophy of Rabindranath Tagore বই-এ বলেছেন —

"In interpreting the philosophy and message of Rabindranath Tagore, we are interpreting the Indian ideal of philosophy, religion, and art, of which his work is the outcome and expression, we do not know whether it is Rabindranath's own heart or the heart of India that is beating here."

রবীন্দ্রভাবনার ঔপনিষদিক অখণ্ড ভারত থেকে জীবনানন্দের কাব্য ছিল একেবারে বিপরীতে, বহুদূরে, জটিল পৃথিবীর দুর্বোধ্য মানসিকতার আবহে। আধুনিক কাব্য আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দে আসতে কালের হিসেবে বেশি সময় না নিলেও ঠিক আগের মতোই এই নতুন অভ্যাসে রপ্ত হতে সময় নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা — দার্শনিক চেতনার মূলে ছিল আগাগোড়া বিশ্বাসের অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রপরবর্তী অধ্যায় চিহ্নিত হয়েছে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনে। জীবনানন্দও এর থেকে ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রনাথকে সভ্যতার বিষ নীল করতে পারেনি।

উপনিষদের ইতিবাচক ভাবনা কবি-সার্বভৌমকে আড়াল করেছিল ক্ষয় থেকে। উপনিষদের পাঠ জীবনানন্দেরও ছিল। দেবেন্দ্রনাথের মতো সত্যানন্দও জীবনানন্দের শৈশবের আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মধুবাতা ঋতায়তের স্নিগ্ধতা — চিরাচরিত ভারতবর্ষের এক স্মৃতিমেদুরতা। জীবনানন্দের ভাষায় —"প্রায় রোজ শেষরাত্রে বিশেষতঃ হেমন্ত ও শীতকালে উপনিষদের শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে তিনি আমাদের অপরূপ সূর্যচেতনার প্রভাতে নিয়ে আসতেন।" কিন্তু চিরকালকে ছাপিয়ে সমকালের দাবি জোরদার হয়ে উঠলে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অস্থিরতা জীবনানন্দকে নাড়া দেয়। তথাপি চিরকাল তাঁর কবিতায় still point-এর মতো রয়ে গেছে এবং অদ্ভুতভাবে মিশে গেছে এই দুটি সময়ের স্রোত। এলিয়টও ভেবেছেন ঠিক একইভাবে —

"All great art is in a sense a document on its time, but great art is never merely a document, for mere documentation is not art. All great art has something permanent and universal about it, and reflects the permanent as well as changing....."

ইতিহাসচেতনায় অনুসৃত ও সমৃদ্ধ হয়ে বর্তমান সভ্যতার উন্মথিত বেদনার বিষ পরিপাক করে জীবনানন্দ পেয়েছিলেন সেই আনন্দস্বরূপ প্রত্যয়কে —

'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে চলেছে
নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।—

(সময়ের কাছে, সাতটি তারার তিমির)

তবে তাঁকে পেরিয়ে আসতে হয়েছিল ডাঁশা ভাঙা নাক, হিম স্তন, চুন চুন চোখ, খড়ি-ওঠা মুখ, অবৈধ সংগম। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী মূল্যবোধের এই ক্লান্তি রবীন্দ্রনাথের ছিল না। জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হানাহানি, দুর্ভিক্ষ, মারী, দারিদ্র্য, মানবতার বিকার — এ সমস্তই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নতুন সময়ে। আর এই নতুন সময়ের চাপে বিচলিত হয়েছিলেন জীবনানন্দ। রবীন্দ্রনাথের মতো জীবনানন্দ নিঃসংশয় হতে পারেননি। তাঁর ব্যথা উপশমের জন্য কেউ দ্বার খুলে দেয়নি। সভ্যতার এই অমানবিক জঙ্গলে প্রতিমুহূর্তে জীবনের ক্ষয়কে তিনি টের পেয়েছিলেন। চারিদিক থেকে কেবল বিচিত্র ভয় ক্লান্তি অবসাদ —

"দূরে কাছে কেবলি নগর ঘর ভাঙে;
গ্রাম পতনের শব্দ হয়;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।" (পৃথিবীলোক)

তাই ইতিহাসভাবনা ও সমাজচেতনার যে সীমারেখায় এসে রবীন্দ্রনাথ থামলেন, ঠিক সেইখান থেকে শুরু করলেন জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে নতুন এক শিল্প আঙ্গিকে এবং সম্পূর্ণ অন্যরকম এক ইতিহাস চেতনায় অন্যতর এক সময়ের বৃত্তে। কেননা রবীন্দ্র দর্শন ও কাব্যই সভ্যতার শেষ কথা নয় — বিশেষ করে এই ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে, যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে